

মুক্ত আলোচনায়
অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

১৬ বছর বয়সের
আগে সেল ফোন
ব্যবহার নয়



মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের জন্যে শুধু বিপজ্জনক নয়, বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের সমান তাপ বিকিরণ করে এই মোবাইল ফোন। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৫ মিনিট মোবাইল ফোনে কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বেড়ে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরো বেশি। বিজ্ঞানীরা তাই মতামত দিয়েছেন, ১৬ বছর বয়সের নিচে কোনো অবস্থাতেই সেল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

মোবাইল ফোনে কথা ২০ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। প্রয়োজনে একটানা সর্বোচ্চ তিন মিনিট কথা বলা যেতে পারে। তবে পরবর্তী ব্যবহারের আগে অবশ্যই ১৫ মিনিট বিরতি দিতে হবে। যাতে এ সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসতে পারে।

এখন আমাদের দেশে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এর সম্ভাব্য প্রধান কারণ লোকালয়ে অনিরাপদ উচ্চতায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

আমাদের এখনকার জীবনযাত্রায় মোবাইল ফোন একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারে রয়েছে অজানা বহু স্বাস্থ্যঝুঁকি। তাই এ ব্যাপারে যত সচেতন হবো, রোগ-ব্যাধি থেকে আমরা তত দূরে থাকতে এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে পারব।

১ মে ২০১৭ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী-শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত।



বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

শুকরিয়া, নিয়মানুবর্তিতা ও সঠিক খাদ্যাচার দেহ-মনকে রাখে সুস্থ

নিজের সুস্থতার দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকেই। এ দায়িত্ব চিকিৎসক বা অন্য কারো নয়। আর সুস্বাস্থ্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি। শরীরের নির্দিষ্ট কোনো মাপ বা বিশেষ কোনো খাবার নয়; বরং শুকরিয়া, নিয়মানুবর্তিতা ও সঠিক খাদ্যাচারই দেহ-মনকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ রাখে। একজন মানুষকে করে তোলে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অধিকারী।

২ আগস্ট ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের স্বাস্থ্য ও হয়ে উঠেছে বাণিজ্যের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। ফলে 'সুস্বাস্থ্য' মানে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নির্দিষ্ট মাপ বা বিশেষ মাপের ফিগার' জাতীয় ভ্রান্ত ধারণাগুলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। যদিও এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ডলারের একটি বাণিজ্য বৈ কিছু নয়। কারণ বিশেষ মাপের ফিগার মানে সুস্বাস্থ্য নয়, সুস্বাস্থ্য হচ্ছে মনোদৈহিক সুস্থতা ও প্রাণবন্ততার এক অনির্বচনীয় আনন্দ-অনুভূতি।

সুস্থতার জন্যে সঠিক খাদ্যাচার অনুসরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে গুরুজী বলেন, কী খাচ্ছি কতটুকু খাচ্ছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু তার চেয়েও জরুরি বিষয় হলো খাবার গ্রহণের সময় কিছু নিয়ম পালনে মনোযোগী হওয়া। যেমন, খাবার গ্রহণ করতে হবে শুকরিয়া ও মৌনতার সাথে। আসলে এটা খাবারের আদব। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের

সুস্থতা ও প্রাণচাঞ্চল্যের রহস্য এটাই। যে খাবারই সামনে থাকুক স্রষ্টার নেয়ামত হিসেবে তারা সেটা কৃতজ্ঞচিত্তে নীরবে গ্রহণ করে।

অথচ অধিকাংশ পরিবারে অনেক ভালো খাবার সামনে নিয়েও অসন্তোষ, নেতিবাচক মন্তব্য, খাওয়ার সময় নানারকম গীবত-পরচর্চা একটি অতি পরিচিত দৃশ্য। আর এটা কোনোভাবেই সুস্থ মানসিকতাসম্মত হতে পারে না। আমাদেরও এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে-করণাময়ের শুকরিয়া আদায় করা ও মৌনতার সাথে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া। কারণ



অনেক কিছু খেলেই পুষ্টি হয় না, বরং সঠিক খাদ্যাচার অনুসরণের মধ্য দিয়ে দেহ খাবার থেকে আহরণ করে নিতে পারে প্রয়োজনীয় পুষ্টি।

এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো নিয়মানুবর্তিতা। আমরা ধার্মিক, আর প্রতিটি ধর্মই আমাদের নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়। ইসলামেরও অন্যতম শিক্ষা এটাই। তাই ঘুম, জেগে ওঠা, খাবার, ব্যায়াম প্রতিটি ক্ষেত্রেই রুটিন অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই আমরা অনুভব করব অফুরন্ত উদ্যম ও সুস্থতা। জীবন ভরে উঠবে প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্যে।

কোরবানির পশুর
দাম প্রচার থেকে
বিরত থাকুন

বছর ঘুরে আবার এসেছে পবিত্র ঈদুল আজহা। সামর্থ্যবান মুসলমানরা পশু কোরবানি দেয়ার মধ্য দিয়ে যা পালন করে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হলো-নিজের ভেতরে পাশবিক যা-কিছু আছে তাকেই মূলত কোরবানি দেয়া। অর্থাৎ রাগ ঘৃণা ঈর্ষা হিংস্রতা এবং সমস্ত নেতিবাচকতা মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা।

এটাই কোরবানির সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি। এর লক্ষ্য মূলত আত্মিক পরিশুদ্ধি। কিন্তু বিশ্বজুড়ে জেকে বসা পণ্যদাসত্ব ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব এসে পড়েছে আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোতেও!

ভুল জীবনদৃষ্টির কারণে সবকিছুই রূপ নিয়েছে ব্যবসা ও লোক-দেখানো আড়ম্বর আর নিজের সামর্থ্য প্রদর্শন করে বাহবা কুড়ানোর মাধ্যম হিসেবে। ফলে আমরা ধর্মচার পালন করি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। অনৈতিকতা দুর্নীতি প্রভারণা মিথ্যাচার চলতেই থাকে।

তাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণ বরকত পেতে হলে সব ধরনের বাহুল্য ও প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যা প্রথম থেকেই বিভিন্ণভাবে চর্চা করে আসছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। এর ধারাবাহিকতায় গুরুজীর আহ্বানে ফাউন্ডেশনের সদস্যরা ২০১৫ সালে সিদ্ধান্ত নেন-পবিত্র ঈদুল আজহা সবাই পালন করবেন সত্যিকার ত্যাগের চেতনায়, যা মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।

এ প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, 'কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞেস করবেন না এবং কেউ জানতে চাইলে বলবেন, আল্লাহ যেটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করেছে। কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না। কারণ কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়। এটি পরম করণাময়ের নির্দেশ পালনের একটি অনুষঙ্গ মাত্র।'

আসুন, লোক-দেখানো জৌলুস ও বাহুল্য পরিহার করে ঈদুল আজহা পালন করি শুধু মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৩৩ তম কোর্স II ঢাকা

৬, ৭, ৮ ও ৯ অক্টোবর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

বরেণ্য ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সুপারনিউমেরারি অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। ১৭ জুলাই ২০১৭ ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় তার প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন এখানে তুলে ধরা হলো, যাতে উঠে এসেছে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের নানা দিক।

মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বাঙালির ইতিহাস আত্মমর্যাদার ইতিহাস

১৯১১ সাল। ভারতবর্ষে চলছে ব্রিটিশ শাসন। ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে এলেন বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে। সে-সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা গোখলেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমরা ইংরেজরা তোমাদের রেলপথ-রাস্তাঘাট বানিয়ে দিচ্ছি, টেলিফোন এসেছে, তোমরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হচ্ছে, ভালো বেশভূষা পরছ। তবু তোমরা স্বাধীনতা চাও কেন? কালবিলম্ব না করে গোখলে উত্তর দিয়েছিলেন, আমাদের আত্মমর্যাদা আছে বলেই স্বাধীন হতে চাই।

বাঙালিরাও বার বার স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে, কারণ তাদের আত্মমর্যাদা আছে। স্বাধীনতা মানে সমৃদ্ধি। স্বাধীন না হলে মানব-অস্তিত্বের বিকাশ প্রশ্নবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যত প্রতিরোধ হয়েছে, তার সিংহভাগই বাংলা অঞ্চলে। যেমন, ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন।

সুপ্রকাশ রায় রচিত ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বইতে আছে, স্বাধীনতার স্পৃহা থেকে বাঙালিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ২০০টিরও বেশি প্রতিরোধ আন্দোলন করেছে। তাই স্বাধীনতার অন্বেষাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অন্য নাম।

গণতন্ত্র ও সুশীল সমাজের সূতিকাগার প্রাচীন বাংলা

পশ্চিমারা দাবি করে, গণতন্ত্রের সূচনা প্রাচীন গ্রীসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। অথচ ইতিহাস বলে, তারও একশ বছর আগে বাংলায় গণতন্ত্রের শেকড় ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই অঞ্চলে ছোট ছোট গণরাজ্য ছিল। প্রতিটি রাজ্যে একটি পরিষদ রাজা নির্বাচন করত। যতদিন ঐ পরিষদ রাজার প্রতি আস্থা রাখত রাজা ততদিনই ক্ষমতায় থাকতেন। পরিষদ আস্থা হারালে রাজা বিদায়।

গণতন্ত্রের এই চর্চা দেখা যায় রাজা গোপালের সময়ও। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক লোকান্তরিত হওয়ার পর এদেশে শুরু হয় মাৎস্যন্যায় যুগ। এ অরাজক সময়ে আইন-শৃঙ্খলা কিছুই ছিল না। সংশয়-শঙ্কার মধ্য দিয়েই কাটছিল সাধারণ মানুষের জীবন।

৭৫০ সালের দিকে সমাজের নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষ সম্মিলিত হলে। তাদের বলা হতো প্রকৃতিপুঞ্জ। এখনকার ভাষায় সুশীল সমাজ। এই প্রকৃতিপুঞ্জ ক্ষত্রিয় গোপালকে বাংলার রাজা মনোনীত করলেন। তবে তারা শর্ত দিলেন—সুশাসন দিতে না পারলে তোমার রাজত্ব থাকবে না।

বিদেশি পণ্ডিত অধ্যাপকরা ইদানীং এসে ওয়াজ-নসিহত করে যায়—তোমাদের দেশে সুশাসন নেই। অথচ পশ্চিমা দুনিয়াতে সিভিল সোসাইটি বা সুশাসনের ধারণা যখন জন্মই নেয় নি, তখন মুক্ত গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল বাংলাদেশে!

পাল শাসনামল ৯ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ

গোপালের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলা ঘুরে দাঁড়াল। সারা ভারতবর্ষে বাংলা রাজ্যটি হয়ে উঠল সম্মানিত ও শক্তিশালী। ১১৬১ পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় পালদের শাসন চলল জনগণের সম্মতি সাপেক্ষেই। এটা বাংলার স্বর্ণযুগ।

পালরা ছিল শতভাগ বাঙালি—এ মাটিরই সন্তান। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী

হলেও হিন্দু ধর্মের অনুসারী সিংহভাগ প্রজার ওপর রাজধর্ম চাপিয়ে দেয় নি। বরং প্রজাদের জন্যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সময়েই রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ।

সেন যুগ ৯ বাংলায় জাতিভেদ প্রথার সূচনা

পালরা দুর্বল হয়ে পড়লে দক্ষিণ ভারত থেকে এসে বাংলা দখল করে নিল কটুর ব্রাহ্মণ সেন রাজারা। তারা দেখল এদেশের হিন্দুরা অনেকটা শিথিল। অতএব এদের ভালো হিন্দু বানাতে হবে। '৭১-এ পাকিস্তানিরা যেমন আমাদের ভালো মুসলমান বানাতে চেয়েছিল, এ অনেকটা তেমনি অপচেষ্টা।

এসময় শূদ্রদের ওপর শুরু হলো দারুণ সামাজিক নিপীড়ন। সেন রাজারা বাংলার ইতিহাসে প্রথম ফতোয়া দিল—নমশূদ্ররা পরকালে রৌরব নরকে যাবে। আর ব্রাহ্মণদের ভগবদগীতা পাঠ নমশূদ্ররা শুনে ফেললে ওদের কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হবে। এভাবে সেন রাজারাই বাংলায় জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে। ফলে শাসক আর শাসিতের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলো। এ সুযোগে মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে সহজেই রাজ্য দখল করে নেয়।

ভিনদেশেও প্রশংসিত ছিল বাঙালির নৈতিক মূল্যবোধ

সেন যুগের পর শুরু হলো সুলতানি আমল। টানা দুশো বছর বাংলা দিল্লীর কোনো অধীনতা মানে নি এবং বাংলার সম্পদ বাইরে যায় নি। এ এক বিরাট অর্জন! ১৩৪২ সালে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ দুই বাংলাকে একত্রিত করে উপাধি নেন শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান। বাংলা ও বাঙালি শব্দ দুটিকে সম্মানজনক করে তোলার জন্যে আমরা তার কাছে ঋণী।

তবে আরো বড় কাজ করেছেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ। তিনি দেখলেন, দিল্লীর তুলনায় বাংলা অনেক ছোট রাজ্য। দিল্লীর প্রভাব ঠেকাতে নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি, যার জন্যে তাকে বলা যেতে পারে আধুনিক যুগে স্মল স্টেট ডিপ্লোমেসির জনক। তিনি চীন ও পারস্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করলেন। চীনের সঙ্গে করলেন রাজনৈতিক কূটনীতি। আমাদের রাজদূতরা চীনে যেত, চীনের দূতরা বাংলাদেশে আসত। যদিও ইউরোপে তখনো রাষ্ট্রদূত বিনিময় প্রথার প্রচলনই হয় নি।

চীনা দূতরা দেশে ফিরে গিয়ে অনেকেই আশ্চর্য লিখেছেন। এর কিছু ইংরেজি অনুবাদ আমি লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম চীনারা বাঙালিদেরকে দুটো সার্টিফিকেট দিয়েছে—বাঙালিরা মিথ্যা বলে না এবং কারো সাথে প্রতারণা করে না।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানান। এর মধ্য দিয়ে পারস্যের সঙ্গে তিনি সূত্রপাত করলেন সাংস্কৃতিক কূটনীতির। সেইসাথে মক্কা-মদিনায় ধর্মীয় কূটনীতি। অর্থাৎ ত্রিমুখী কূটনীতি। বাংলার অর্থে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যে আরবে নির্মাণ করে দিলেন অসংখ্য মাদ্রাসা, যেগুলো পরিচিত ছিল গিয়াসিয়া মাদ্রাসা নামে। পাশাপাশি ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাও আরবে পাঠিয়ে দিলেন দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্যে। আর সংস্কার করে দিলেন মজে যাওয়া জলাধার 'নহরে জুবাইদা'।

এখন কোনো অনুষ্ঠানে সৌদিদের সাথে দেখা হলে তাই আমি বলি, তোমরা আমাদের মিসকিন বলো। তোমরাই একসময় মিসকিন ছিলে। আমাদের টাকায় তোমাদের দেশে মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে।

বাংলার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু এ ইতিহাস যেভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল, তা আজও এদেশে হয় নি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ—সত্য ইতিহাস জানার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্যে। কোয়ান্টাম যে ইতিবাচকতার কথা বলে তা অনুসরণ করলে আমাদের জীবন ও সমাজ অনেক স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি সত্য জানা ও উপলব্ধি আমাদেরকে পরিণত করবে এক মহান জাতিতে।

[অনুলিখিত]

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আপনাকে রাখবে সুস্থ, প্রাণবন্ত ও কর্মোদ্যমী

যুথবন্ধতাই শক্তি

মানুষ একা নয়। কোনো না কোনোভাবে সে একত্রিত ও যুথবদ্ধ। জগতের প্রাণীকূলে এ তার এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। পরিবারমুখিতা মানুষের চিরায়ত ও সহজাত প্রকৃতি। এ-ছাড়াও জীবনের পরতে পরতে বিভিন্ন উপলক্ষে সে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে নানা সামাজিক বন্ধনে। এসব সম্পর্কের গাঁথুনি যার জীবনে যতটা সুনিবিড় ও দৃঢ়, জীবনটাও তার কাছে ততটা উপভোগ্য ও সহজ। সমাজতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণে এ আজ এক সার্বজনীন সত্য।

কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণে সম্ভষ্ট নন একবিংশ শতকের বিজ্ঞানীকুল। তাদের চাই প্রমাণ, চাই শক্তপোক্ত তথ্য-উপাত্ত। যার হৃদিস মিললেই কেবল তারা এর পক্ষে রায় দেন। ঠিক তেমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিচালিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

আর এ গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সুখম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে যারা বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পান, তারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু হন। গবেষকদল জানাচ্ছেন, আসল রহস্যটা এসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনানুভব—এদের খাদ্যাভ্যাস তুলনামূলক স্বাস্থ্যকর, এরা কমবেশি নিয়মিত ব্যায়াম করেন। সবমিলিয়ে তাদের জীবনধারা অনেকটাই সুস্থ। মানসিক দিক থেকেও তারা অধিকতর সক্ষম। কারণ তাদের গভীর বিশ্বাস—আসুক যতই কঠিন সময়, কেউ না কেউ পাশে এসে ঠিক দাঁড়াবেই।

পরিবার চিরসত্য, চিরসুন্দর ॥ পারিবারিক বন্ধনে বাড়ে আয়ু

পারিবারিক একাত্মতা জীবনকে সুন্দর করে। করে তোলে অর্থবহ। বিজ্ঞানীরা রীতিমতো জোর দিয়ে বলছেন, পারিবারিক সম্প্রীতির সাথে মানুষের দীর্ঘায়ু অর্জনের সম্পর্কটা একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত। তাদের মতে, বাবা-মা, সন্তান ও ভাইবোনদের সাথে কাটানো আনন্দঘন মুহূর্ত দীর্ঘায়ু লাভে বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন যাদের দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে ঘটে ঠিক উল্টোটা।

পারিবারিক একাত্মতার সুফল মানুষ পেতে শুরু করে জীবনের গোড়া থেকেই। যেসব পরিবারে বাবা-মা ও সন্তানদের মাঝে উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজমান, ক্যাম্পারের মতো অসুখে পড়ার সম্ভাবনা তাদের কম। এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব পরিবারে একত্রে খাওয়াদাওয়ার রীতি চালু আছে, তারা প্রায়শই সুস্থ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত। সাম্প্রতিক আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, এসব পরিবারের শিশুরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।

৫৭ থেকে ৮৫ বছর বয়সী তিন হাজার মানুষের ওপর ২০১৬ সালে পরিচালিত হয় একটি বড় আকারের গবেষণা। যার ফলাফল উপস্থাপন করা হয় আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায়। তাতে বলা হয়েছে, এই প্রবীণদের মধ্যে যারা তাদের পরিবারের সদস্য ও আপনজনদের প্রতি গভীর সখ্যতা অনুভব করেন তাদের মৃত্যুঝুঁকি

পরবর্তী পাঁচ বছরে নেমে আসে ছয় শতাংশে, অন্যদিকে যারা তাদের একান্ত সম্পর্কগুলোতে এ উষ্ণতাকে খুঁজে পান না, তাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশে।

গবেষকরা মনে করছেন, পরিবারের সদস্য ও প্রিয়জনদের প্রতি দায়িত্ববোধই এসব মানুষকে দীর্ঘজীবন লাভের ব্যাপারে আশাবাদী ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডালা-লানা স্কুল অব পাবলিক হেলথের পোস্ট ডক্টরাল গবেষক জেমস ইভেন্যুক বলেন, তাই আমাদের উচিত পরিবারের সদস্য-স্বজনদের সাথে আরো একাত্মতা বাড়াতে, একে অন্যকে এড়িয়ে চলা নয়।

ভাইবোনে হৃদয়তা ॥ বাড়ায় তৃপ্তি ও আনন্দ কমায় উদ্বেগ, বিষণ্ণতা

আপনি ভালো আছেন, সুস্থ সুন্দর সফল আনন্দময় জীবনযাপন করছেন, এর কিছু কৃতিত্ব কিন্তু দিতে হবে আপনার ভাইবোনদেরও। ভাইবোনের সাথে সম্পর্কটা যাদের মধুর, তারা দৈহিকভাবে তুলনামূলক সুস্থ এবং মানসিক দিক থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবনযাপন করেন। এমনটাই মত গবেষকদের।

২০১৫-তে ২৪৬টি পরিবারের সন্তানদের নিয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইবোনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে যারা যতটা ইতিবাচক ও একাত্ম, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়ার হার ওদের ততটাই কম।

আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশেষত বোনদের সাথে একাত্মতা রয়েছে যাদের—একাকিত্ব, ভালবাসাহীনতা, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, উদ্বেগ, এমনকি ভয়ের মতো নেতিবাচক অনুভূতির আত্মসন তাদের জীবনে অনেক কম। আর বয়স এতে কোনো বাধা নয়। কারণ পরিণত বয়সের সুসম্পর্কধারী ভাইবোনদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণাতেও দেখা গেছে, তারা অপেক্ষাকৃত সুখী ও আনন্দময় জীবনযাপন করেন। এ-ছাড়াও নিজেদের পাশাপাশি অন্য আত্মীয়স্বজনদের সাথেও বজায় থাকে তাদের সম্পর্কের উষ্ণতা।

দাম্পত্য সুসম্পর্কে প্রাপ্তি অশেষ

আপনার দাম্পত্যসঙ্গী অর্থাৎ স্বামী/স্ত্রীর সাথে উষ্ণ ভাব-বিনিময় ও কথোপকথন আপনাদের সম্পর্কটাকে গভীর আর মজবুত করে তো বটেই, সেইসাথে রাখে সুস্থ, বাড়ায় দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা। ২০১৭ সালে ১৬২টি যুগলের ওপর পরিচালিত একটি অতি সাম্প্রতিক

গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের পারস্পরিক আলাপনটা যেদিন সুখপ্রদ ও ইতিবাচক ছিল—সেদিন তারা একাকিত্বে ভুগেছেন কম, অনুভব করেছেন অধিকতর হৃদয়তা, ব্যায়াম করার ব্যাপারে ছিলেন তুলনামূলক বেশি আগ্রহী। অন্যদিনের তুলনায় তাদের ঘুমটাও সেদিন হয়েছে বেশ ভালো।

এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের গনজাগা ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট সারাহ অ্যারপিন বলেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা-অনুভূতি ও সুখবরগুলো যখন আপনি দাম্পত্যসঙ্গীর সাথে শেয়ার করেন, তখন নিশ্চিতভাবেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আপনার স্বাস্থ্যে ও।

পারিবারিক ও সামাজিক একাত্মতা দেয় সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

বিশ্বজুড়ে আধুনিক ধারার সমাজবিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য-গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে এটা আজ এক প্রমাণিত সত্য যে, পারিবারিক ও সামাজিক একাত্মতা একজন মানুষকে সুস্থ সুখী সফল জীবনের পথে চালিত করে। তাই আমাদেরও উচিত এ যুথবদ্ধ জীবনযাপনের প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগানো। এবং প্রয়োজন আমাদের উত্তরপ্রজন্মকেও সাধ্যমতো এ জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তোলা।

তাই যে-কোনো বিষয়ে পারিবারিক আলোচনা, পরিবারের সবাই অন্তত একবেলা একসাথে খাওয়া ইত্যাদি আচরণ-অভ্যাসের পাশাপাশি সজ্ঞবদ্ধভাবে নৈতিকতার চর্চায়ও মনোযোগী হোন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে সাদাকায়ন-আলোকায়নসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিন। সেখানে অন্যদের সাথে পরিচিত হোন, পরিবারের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিন। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারে ধর্মবাণী পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

সুখম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্য এবং প্রিয়জনদের পরিচালিত করুক সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে।

ডা. আতাউর রহমান

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)



নিজের সাথে একাত্ম হতে পেরেছি

ফাহ্নুনি হামিদ



কোর্সের প্রথমদিন থেকে লক্ষ্য করছি, আলোচনার প্রতিটি বিষয় খুব সহজভাবে নানা উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, যা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমার অংশ নেয়ার অন্যতম কারণ

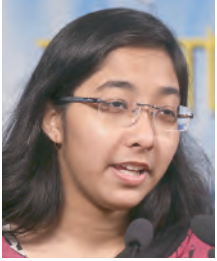
ছেলের উৎসাহ। বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে যে, এ যুগের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া একজন তরুণের যদি এই কোর্স ভালো লাগে, তাহলে এখানে অবশ্যই ব্যতিক্রমী কিছু আছে।

এখানে এসে মেডিটেশনের মাধ্যমে এই চার দিন সহজেই আমরা নিজের সাথে একাত্ম হতে পেরেছি। আমার মনে হয়েছে, এই কোর্স একজন অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাসী হতে সাহায্য করবে।

[বিশিষ্ট অভিনেত্রী, লেখক এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রাক্তন পরিচালক। ৪৩০ ব্যাচ]

সমমর্মী হতে শেখাল কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

নুসরাত রহমান



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমার মধ্যে একটা প্রত্যাশাই কাজ করেছে-কোর্স শেষে আমি যেন একটা নতুন জীবন নিয়ে বাসায় ফিরতে পারি। আমি অনেক নেতিবাচকতার মধ্যে ডুবে ছিলাম।

আমার মধ্যে বহু রাগ-ক্ষোভ জমে ছিল।

মেডিটেশনে গুরুজী যখন মনের জমানো রাগগুলো ঝেড়ে ফেলার এবং ক্ষমা করার উপায় বললেন, তখন আমি সহজেই অন্যদের ক্ষমা করে দিতে পারলাম, যা আমার কাছে এতদিন অসম্ভব একটি ব্যাপার ছিল।

তারপর থেকে নিজেকে অনেক প্রশান্ত মনে হচ্ছে। এখন ভাবছি, ক্ষমা করা এত সহজ! আসলেই ঘৃণা করা যতটা কঠিন, ক্ষমা করা এখন ততটাই সহজ। মানুষের প্রতি আমি সমমর্মী হতে শিখেছি। অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতাও আমার বেড়েছে। জীবনকে কীভাবে গড়তে হবে, তা-ই আমাকে শেখাল এই কোর্স।

জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারছিলাম না বলে এতদিন আমার মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করত। কিন্তু কোর্সে এসে মনছবির মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল ও কলেজ। ৪৩০ ব্যাচ]

যা পেলাম তা আমার পাথেয় হয়ে থাকবে

ড. নির্মল চন্দ্র শীল



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমার যা উপলব্ধি, সেটা আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। গুরুজী অত্যন্ত সাবলীলভাবে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। জীবন

ধারণার সহজ-সরল পথ থেকে শুরু করে সমাজে আমাদের করণীয়, এমনকি প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কেও বলা হয়েছে এ কোর্সে।

যোগ-মেডিটেশন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শহুরে জীবনে প্রযুক্তির উৎকর্ষের মাঝে প্রায় হারিয়ে যাওয়া যোগ-ধ্যান এ যুগে চর্চা করতে পারায় সত্যিই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। পাশ্চাত্যেও এখন যোগ-ধ্যানের চর্চা হচ্ছে। এখানে যা পেলাম, তা আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।

[মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। ৪২৯ ব্যাচ]

আট বছর পর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমাতে পেরেছি

সায়েলা ইয়াসমিন



দীর্ঘ আট বছর ধরে আমার ঘুমের সমস্যা। ঘুমের ওষুধ খেয়েও ভালোমতো ঘুমাতে পারতাম না। এজন্যে আমার মেজাজটাও দিনদিন খিটিখিটে হয়ে যাচ্ছিল।

এ-ছাড়াও আমার ডায়াবেটিস, উচ্চ

রক্তচাপ এবং মেরুদণ্ডে ছিল প্রচণ্ড ব্যথা। এসব সমস্যার জন্যে ইনসুলিনসহ প্রতিমাসে আমাকে ১২ হাজার টাকার ওষুধ খেতে হতো।

মেরুদণ্ডের ব্যথার কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েও কোনো উপকার হচ্ছিল না। অথচ কোর্সে এসে মেডিটেশন করে এক পর্যায়ে অনুভব করলাম, আমার মেরুদণ্ডে কোনো ব্যথা নেই।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমার ঘুমের সমস্যাও দূর হয়ে গেছে। দীর্ঘ আট বছর পর কোনোরকম ঘুমের ওষুধ ছাড়াই আমি ঘুমাতে পারছি। এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের একটি অনুভূতি, যা আমি কখনোই ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এখন আমি বেশ ভালো আছি। কোয়ান্টাম মেথড আমার জীবনে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। আমার স্বামীকে ধন্যবাদ জানাই, তিনিই আমাকে এ কোর্সে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

[গৃহিণী। ৪৩১ ব্যাচ]

এ কোর্স নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার উদাহরণ

সৈয়দ ফকরুদ্দিন আল রাজী



আমি বিশ্বাস করি, ইসলাম সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত একটি ধর্ম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমার মনে হয়েছে, আলোচ্য প্রতিটি বিষয়ই বিজ্ঞানসম্মত এবং পুরোপুরি ধর্মসম্মত।

কোর্সের চার দিন কোরআনের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বগুলোকেই বার বার আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিনিয়ত আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের বাণীগুলোই বলা হয়েছে নানাভাবে।

এখানে এসে সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা ও সম্মানের মনোভাব দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। বিশেষত কোয়ান্টামে সময়মতো প্রোথাম শুরু এবং শেষ করার বিষয়টি আমার খুব ভালো লেগেছে। নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা তো আসলে ইসলামেরই শিক্ষা।

[খতিব, পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, কুমিল্লা। ৪৩১ ব্যাচ]

ডাক্তার বললেন, মেডিটেশন কোর্সটি করুন

অনুপ কুমার সেন



গত বছর আমার হাটে দ্বিতীয় বারের মতো রিং লাগানো হয়। এতেও আমি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারি নি। সারাদিন রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেও রাতে হঠাৎ অনেক বেড়ে যেত।

দেশের একটি

বড় হৃদরোগ হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে আমি এবার স্থায়ী সমাধান চাইলাম। বললাম-আর কতদিন আমাকে এভাবে ওষুধ খেয়ে চলতে হবে! আমি এ থেকে মুক্তি চাই। তখন চিকিৎসকই আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পরামর্শ দিলেন।

চার দিনের এই কোর্স সম্পন্ন করে আমার মনে হয়েছে, উচ্চ রক্তচাপের জন্যে আমাকে ভবিষ্যতে আর ওষুধ খেতে হবে না। কারণ এই চার দিন আমার রক্তচাপ মেপে দেখেছি এবং তা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। আমার বিশ্বাস, আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাব। এই বিশ্বাস অর্জন সম্ভব হয়েছে শুধু মেডিটেশনের জন্যেই।

এ-ছাড়া আগে রাতে আমার ভালো ঘুম হতো না। তাই আমি সময়মতো সকালে উঠতে পারতাম না। এখন আমি সকালে ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারছি। জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো থাকার জন্যে মেডিটেশন চর্চা আমাকে সহযোগিতা করছে।

[সহকারী প্রধান শিক্ষক, বকশীগঞ্জ এন এম উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর। ৪৩১ ব্যাচ]

বিজ্ঞানসম্মত একটি প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম মেথড

ডা. মো. আতাউল হাসান



আমাদের দেহে দুই ধরনের হরমোন আছে। এক ধরনের হরমোন শরীরে ভালো প্রতিক্রিয়া ঘটায়, অন্যটা বিপরীত কাজ করে। ইতিবাচক কথা বললে বা ইতিবাচক চিন্তা করলে ভালো হরমোন নিঃসৃত হয়

এবং আমাদের দেহ-মন ভালো থাকে। আর নেতিবাচকতার চর্চায় এর উল্টোটা ঘটে। মানবদেহের সাথে বিজ্ঞানের এই যোগসূত্রই আমি এ কোর্সে এসে দেখলাম, যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত।

এই চার দিন মেডিটেশন করে আমি মানসিকভাবে আরো স্থির হতে পেরেছি, যা আমার চিকিৎসক জীবনে রোগীদের সেবা দিতে অনেক সাহায্য করবে। পেশাজীবনে অনেক ধরনের কোর্স করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড আমার জীবনের সেরা কোর্স। কারণ এটা জীবনের জন্যে শিক্ষা প্রদান করে। ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় এখানে এসে পেলো।

[ডেন্টাল সার্জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ৪২৯ ব্যাচ]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করে প্রশান্ত থাকতে শিখেছি

কে. এম. হামিদুল হক



আল্লাহর রহমতে আমি শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ। তাই কোর্সে এসে আমার অনুভূতি একটু ভিন্ন। আমার মনে হয়েছে, সারাটা জীবন আমি একটা রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়েছি। আমি ভাবতাম, একটা

রেসের ঘোড়া যতটা আগে দৌড়াতে পারে, তত তার দাম বাড়ে।

সারা জীবন আমি এভাবেই পরিশ্রম করেছি। দিনের শেষে কী হবে বা জীবনের শেষ পরিণতি কেমন হবে—এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু কোয়ান্টামের সংস্পর্শে আসার পর জীবনের সুন্দর সমাপ্তির বিষয়টি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম।

কোর্সটি করে মনে হচ্ছে, কোয়ান্টাম মেথড আমাকে দিয়েছে পরিপূর্ণ জীবনের দিক-নির্দেশনা। এতে সবই আছে—জীবন কীভাবে সুন্দর করতে হবে এবং কীভাবে স্বস্তির সাথে যাপন করতে হবে।

আমি মনে করতাম, রাগ পৌরুষের লক্ষণ। এটা না থাকলে আমার পরিবারের সদস্যরা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আমাকে মানবে না। মেডিটেশন করে আমার এই ধারণাটা পাল্টে গেছে। রাগ না করে প্রশান্ত থেকেই বরং সম্মান বেশি পাওয়া যায়।

[ব্যবসায়ী। ৪৩১ ব্যাচ]

আমি পারি—এই বিশ্বাস আবার ফিরে পেয়েছি

মোসাম্মৎ রেবেকা সুলতানা



গত দুই বছর ধরে আমার মধ্যে এক ধরনের অযাচিত ভয় কাজ করছিল। গাড়িতে উঠলেই মনে হতো, এই বুঝি কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে। আর পেশাগত কারণে আমাকে দিনের অনেকটা সময় গাড়িতেই কাটাতে হয়।

এ-ছাড়াও দুই বছর যাবৎ আমি প্রচণ্ড ঘাড়ের ব্যথাও ভুগছি। এর সাথে যোগ হয়েছে হাঁটু ব্যথাও। মানসিকভাবে আরো ভেঙে পড়লাম যখন ডাক্তার আমাকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু গুরুজীর আলোচনা শুনে বুঝতে পারলাম, মনোদৈহিক এ সমস্যাগুলো আমার বিষণ্ণতা ও ভয় থেকেই এসেছে। উপলব্ধি করলাম, মেডিটেশনের মাধ্যমে এগুলো সহজেই দূর করা সম্ভব। মেডিটেশন ক্লাসে বসেই একসময় অনুভব করলাম, আমার ঘাড় ও হাঁটুতে আর ব্যথা নেই। এখন আমি রুকু-সেজদা দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছি।

আমি পারি—এই বিশ্বাসটা আমার মধ্যে আবার সঞ্চারিত হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড-এর মাধ্যমে। এ কোর্স আমার জীবনে এত বড় সাফল্য আনবে তা ভাবতে পারি নি।

[প্রধান শিক্ষক, নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। ৪৩০ ব্যাচ]

কোয়ান্টাম জীবন বদলের আলোকিত যাত্রা

বাবলু চাকমা



প্রায় ১৫ বছর আগে আমি সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড বইটি হাতে পাই। বই পড়ে মেডিটেশন কিছুটা চর্চাও করেছি। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আমার কিছু ভুল ধারণা ছিল। সেজন্যে এই কোর্সটি আর করা হয়ে ওঠে নি।

কোর্স করার পরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আমি সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। আর চার দিনের এ কোর্সে অংশ নিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেথড জীবন বদলের আলোকিত একটি যাত্রা।

মেডিটেশনের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছি, প্রতিটি মানুষের জীবনে মনছবির গুরুত্ব অনেক। এখন আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সবার মনছবিগুলো মিলিয়ে আমরা এদেশকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারব।

[প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, কাপেং ফাউন্ডেশন। ৪৩১ ব্যাচ]

আমার মনের দরজা খুলে গেছে

এস আই টুটল



আমার ছোট্ট সন্তানটি যখন ভয় পায়, আমাকে জড়িয়ে ধরে। সে আমাকে অবলম্বন মনে করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি আমার পিতাকে হারিয়েছি। তাই আমার মধ্যে খুব ছোটবেলা থেকেই পিতৃশ্মের অভাববোধ কাজ করত। আমার সন্তানের মতোই একটা অবলম্বন খুঁজতাম আমিও।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে এবং মেডিটেশন করে আমি যেন সেই অবলম্বন খুঁজে পেয়েছি। মনে হচ্ছে, আমার পাশে কেউ আছে। এ কোর্স মানসিকভাবে আমাকে দৃঢ় করেছে। আমার মনোবল বেড়েছে বহুগুণ।

আল্লাহর রহমতে সঙ্গীতে আমি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি কয়েকবার। এখন বিশ্বাস করি, আমি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সফল হতে পারব। কোয়ান্টামে এসে ইতিবাচকতার চর্চা দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের দেশের সব মানুষ যদি এমন ইতিবাচক হতো! এখানে এসে আমার মনের দরজা খুলে গেছে।

[সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক। ৪৩০ ব্যাচ]

জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি

জ্যোত্সনা খানম জ্যোতি



বেশ কয়েক বছর ধরে আমি মাইগ্রেন ও অনিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার এটাই ছিল মূল কারণ, তবে আরেকটা বড় কারণ হলো নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হওয়া।

আমি অন্যের সাথে প্রায়শই রুঢ় আচরণ করতাম। কিন্তু কোর্সে এসে আমি বুঝতে পেরেছি, জীবন আসলে আমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা। আর পরীক্ষায় পাশ করতে হলে অবশ্যই অন্যের প্রতি সমমর্মী হতে হবে।

মেডিটেশন করে মাইগ্রেনের সমস্যাও দূর হয়েছে। এখন আমি মাইগ্রেন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমাতেও পারছি। আল্লাহর রহমতে আমি এখন অনেক সুস্থ।

ক্যারিয়ার নিয়ে আমি অনেক দ্বিধায় ছিলাম। কোর্সে এসে আমি লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি। তিন সদস্যের ছোট একটি পরিবার হওয়ায় আমার সবসময় আক্ষেপ ছিল—আমার কেউ নেই। কিন্তু এখন আর আমি একা নই। এখানে এসে একটি বিশাল পরিবার পেয়েছি—কোয়ান্টাম পরিবার।

[শিক্ষার্থী, ২য় বর্ষ, নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ, সিলেট। ৪২৯ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি বেসরকারি হাসপাতালের একজন সেবিকা। একটি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছি। চারপাশের পরিচিতরা যখন স্থায়ী চাকরির জন্যে ছুটেছে, তখন স্বেচ্ছায় সরকারি চাকরি হাতছাড়া করেছি। কারণ সরকারি চাকরি আমার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে সহায়ক নয়। কিন্তু নিজের লক্ষ্য, বেসরকারি চাকরির কষ্ট, সরকারি চাকরি ছাড়ায় চারপাশের নেতিবাচকতা ইত্যাদি নিয়ে মাঝে মাঝে হতাশা আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি।

উত্তর : জীবনটাই তো স্থায়ী নয়। সেখানে স্থায়ী চাকরির ধারণাটাই একটা ভ্রান্ত ধারণা। কত সরকারি চাকরিজীবী চাকরিরত অবস্থায় মারা গেছেন! আসলে চাকরি নয়, আপনার প্রয়োজন হচ্ছে কাজ। জীবিকার জন্যে কাজ করতে হয়। আর আপনি কী কাজ করছেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

একটি গল্প আছে—মুরগি হালাল কি হারাম এটা নিয়ে দুই বন্ধুর একজনের কোনো মাথাব্যথা নেই। আরেকজন এ ব্যাপারে খুব সচেতন। সে হালাল দোকান থেকে মুরগির মাংস কিনে এনে বন্ধুকে বলল, তুমি তো কোনোদিন হালাল মুরগি খাও নি, আজ তোমাকে হালাল মুরগি খাওয়াব। খাওয়ার পর বন্ধুটি বলছে, আমি তো স্বাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলাম না।

এখানে বিষয়টি হলো, মুরগি হালাল কিনা এটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি। এর ১০ ভাগের একভাগ চিন্তা আমরা যদি করতাম—যে টাকা দিয়ে আমি মুরগিটা কিনছি সেটা হালাল কিনা, তাহলে আমাদের জীবনযাপন অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ হতো। কারণ হালাল রুজি আত্মিক অগ্রগতি ও আত্মার মুক্তির জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

আপনি জীবনকে দুভাবে দেখতে পারেন। আপনি যদি শুধু জীবিকার জন্যে কাজ করেন, তাহলে কাজের বিনিময়ে টাকা পেলেন, ব্যস এখানেই শেষ। কিন্তু আপনার লক্ষ্য যদি হয় আত্মপীড়িতের সেবা, তাহলে পারলৌকিক পরিব্রাজ্যও আপনি এখান থেকে পাবেন। কারণ একজন মুমূর্ষু মানুষকে আপনি যখন সেবা করছেন, তখন এর চেয়ে পূণ্যের কাজ আর কয়টা আছে?

অতএব, চারপাশে যে যা-কিছু বলুক, যত নেতিবাচকতাই থাকুক, আপনি আপনার লক্ষ্যে অটল থাকুন। কখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন না। আপনার কাজ হলো মানবসেবা। আপনি তার প্রতিদান পাবেনই। আর কাজকে ভালবাসুন, কাজ আপনাকে ভালবাসবে, জীবন আপনাকে ভালবাসবে। জীবনের অর্থ আপনি খুঁজে পাবেন। আর যদি শুধু টাকার জন্যে কাজ করেন, আপনি কখনো জীবনের অর্থ খুঁজে পাবেন না।

প্রশ্ন : আমার ছেলের বয়স দুই বছর নয় মাস। সে কখনো পুরো বাক্য বলে না। আপনি বলেছিলেন, বাচ্চাদের টিভিতে আসক্ত হতে দিলে সে কথা শিখবে না। আমার ছেলে কার্টুন না দেখলে খায় না। এসব দেখে আমার রাগ হয়। রাগটাকে এখনো দমন করতে পারছি না। আমার রাগ যেন কমাতে পারি, দোয়া করবেন।

উত্তর : সমস্যা তো ছেলের না, আপনার। আপনি ছেলেকে কার্টুন দেখে খেতে শিখিয়েছেন। এখন তো

সে কার্টুন না দেখে আর খাবে না। এখন রাগ করে লাভ কী? ভুল তো কিছুটা প্রথমই হয়ে গেছে।

মা-বাবা সবাইকে বলি, বাচ্চা রেখে বা বাচ্চাসহ টিভি সিরিয়াল দেখবেন না। তাহলে সন্তান নিয়ে পরে আপনার জীবনটাই ওই সিরিয়ালের বিভিন্ন চরিত্রের মতো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

আমরা অনেক সময় নিজেরা গল্প করার জন্যে বাচ্চাকে টিভি, আইপ্যাড, ট্যাব ইত্যাদিতে কার্টুন দেখতে দেই। কিন্তু সে-তো কার্টুনের সাথে কথা বলতে পারছে না। ফলে সে কথা শিখছে না। তাই তার যোগাযোগটা হওয়া দরকার মানুষের সাথে, কার্টুনের সাথে নয়।

সবসময় সন্তানকে সাথে নিয়ে কোয়ান্টাম আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে আসবেন। তাহলে বুঝতে পারবেন, সন্তান লালন করা আর আল্লাহ দেয়া এক কথা নয়। সময় দিতে হবে, সন্তানের বন্ধু হতে হবে এবং সন্তানকে সামাজিক করতে হবে।

অতএব সন্তানকে প্রয়োজনীয় সময় দেবেন। তার সাথে খেলবেন। তার খেলার সাথী হবেন। দরকার হলে আপনি নিজেই কার্টুনের কোনো চরিত্র সাজবেন। আর যখন সে শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকবে, মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আদর করবেন আর বলবেন, তুমি কত ভালো, তুমি কত কথা বলো, তুমি অনেক সুন্দর কথা বলো। এভাবে ক্রমাগত বলতে থাকবেন। কারণ আপনার সন্তান প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক হয়ে গেলে এর চেয়ে বড় কষ্ট আর নেই।

আর মনে রাখবেন, সন্তান কথা বলছে না, এজন্যে যে আপনার রাগ হচ্ছে, এই রাগটা কিন্তু কোনো সমাধান নয়। এটা পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি বরং শান্ত থেকে এ অবস্থায় আপনার কী করণীয় তা নিয়ে ভাবুন এবং সেটা করুন। শান্ত থাকার জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নিন। মনঃস্থিতি দেখুন, আপনার সন্তান স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে এবং সুস্থ সুন্দরভাবে বিকশিত হচ্ছে।

প্রশ্ন : যখন কোনো খারাপ কাজ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিই, তারপর মনে হয় আরেকদিন পর ছাড়ি, এটাই শেষবার। একবার করলে আর এমন কী ক্ষতি! এই ভাবনা থেকে কী করে মুক্তি পাব? কীভাবে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করব?

উত্তর : আসলে এই শেষবারটাই হচ্ছে খুব খারাপ। মানুষ ধরা পড়ে কিন্তু শেষবারে। আপনারা জানেন, আমি একসময় সাংবাদিক ছিলাম। একবার জানার ইচ্ছা হলো যে, চোর ধরা পড়ে কেন? অনেকের সাথে কথা বললাম। তারা বলল, শেষবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। মনে হয়েছে এই শেষবার, এরপরে আর চুরি করব না। তখন ধরা পড়েছি।

অতএব যখন ছাড়তে চাইবেন, দৃঢ়তার সাথে ভাববেন—ছেড়ে দিলাম, আর করব না। কারণ শয়তানের কুমন্ত্রণা হচ্ছে, আচ্ছা একবার করলে কী ক্ষতি হয়! গোলাম আলীর একটা বিখ্যাত গজল আছে—হাস্লামা হায় কিউ বরপা, থোড়িসি যো পিলি হায়/ ডাকা তো নেহি ডালা, চোরি তো নেহি কিয়া।

মানে হাস্লামা করছ কেন? ডাকাতিও করি নি, চুরিও করি নি। অল্প একটু মদ খেয়েছি শুধু। তার জন্যে এত হাস্লামা কেন? এই থোড়িসি যো পিলি—এটাই হচ্ছে খুব বিপজ্জনক। এটা নিয়ে আমাদের

দেশের বিখ্যাত গল্প আছে।

এখন তো সব ম্যারেজ মিডিয়া হয়ে গেছে। আগে এদের বলা হতো ঘটক। তো, ঘটক গেছে এক বাড়িতে প্রস্তাব নিয়ে। হবু জামাই সম্পর্কে খুব ভালো ভালো বর্ণনা করছে। তখন মেয়ের বাবা জিজ্ঞেস করল, খারাপ কিছু আছে কিনা? ঘটক বলল যে, না খারাপ তেমন কিছু নেই। মাঝে মাঝে একটু পেঁয়াজ খায়। জিজ্ঞেস করল, মাঝে মাঝে কখন? বলে যে, যেদিন একটু কাবাব খায় সেদিন একটু পেঁয়াজ খায়। কাবাব কবে খায়? ঘটক বলে, যেদিন একটু মদ খায়। মদও খায়? বলল, সবসময় খায় না, যেদিন একটু বাইজি বাড়ি যায়, সেদিন!

তাই ‘এই শেষবার’ বা ‘এই একটু’ এটা খুব বিপজ্জনক। একবার করলে কী হবে?—এটা ভাবলে আপনি কখনো ছাড়তে পারবেন না। সবসময় বলতে হবে, এই ছেড়ে দিলাম, আর না। সিগারেট ছাড়তে চান, সিগারেট ধরিয়ে যখনই মনে হবে আর খাবেন না, ওটাও খাবেন না। থুথু দিয়ে ফেলে দিন। তাহলে আপনি ছাড়তে পারবেন।

অতএব সবসময় মনে রাখতে হবে যে, থোড়া থোড়া অর্থাৎ একটু একটু করে ছাড়া যায় না। ছাড়তে হয় একবারে।

প্রশ্ন : বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করে যদি আখেরাতে কোনো প্রতিদান না পাই, তাহলে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে কী লাভ? এই প্রশ্নের উত্তর পাই নি, তাই পড়াশোনাতে মনোযোগ দিতে পারি নি।

উত্তর : বাংলা, আরবি, উর্দু, ইংরেজি যে মিডিয়ামই হোক—পড়াশোনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা। সেই জ্ঞান কল্যাণের জ্ঞান, ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারার জ্ঞান। জ্ঞান না থাকলে ভালো-মন্দের, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য আপনি করতে পারবেন না। তাই ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে ফরজ।

আপনার লক্ষ্য যদি মানুষের কল্যাণ হয়, যখন পড়াশোনা করছেন, তখন আপনি ফরজ আদায় করছেন এবং এই ফরজ কাজের সওয়াব আপনি পাবেনই। প্রতিটি ধর্মেই মানুষকে জ্ঞানী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যারা জানে আর যারা জানেন না, তারা কি কখনো সমান হতে পারে?’ (৩৯:৯)

আর আপনাকে বুঝতে হবে, পরীক্ষায় ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হলে আপনার কথাগুলো সহজে গুরুত্ব পাবে। আর যদি থার্ড ক্লাস লাস্ট হন, তাহলে আপনার কোনো কথাই গুরুত্ব পাবে না। অতএব পড়াশোনায় মনোযোগী হবেন। পড়াশোনায় মনোযোগী হলে আপনি জ্ঞানী হবেন এবং জ্ঞানী হলে আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

ফলাফল নিয়ে আমি কখনো অস্থির হবো না। সঠিক প্রক্রিয়ায় আমি আমার কাজ করে যাব।

লক্ষ্যে অবিচল থাকুন সাফল্য আপনারই

মার্চ ১৯৯৬। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২য় দিন মনছবির মেডিটেশনে ষষ্ঠ শ্রেণির এক কিশোর সেদিন আকেন মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন। তারপর থেকে অবিচল আত্মায় তিনি অনুসরণ করে গেছেন মনছবির প্রক্রিয়া। দু-দশক পেরিয়ে সম্প্রতি পাঁচটি অতি তারকা আবিষ্কার করে একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি স্থান করে নিয়েছেন ইতিহাসে। তিনি ড. রুবাব খান। ২৩ জুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন তার সাফল্যযাত্রার অনবদ্য গল্প।



আমেরিকান এস্ট্রোনোমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে (২০১৬) বক্তব্য উপস্থাপন করছেন নাসা-র বাংলাদেশি মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. রুবাব খান

মনছবির মেডিটেশনে খুঁজে পেলাম জীবনের লক্ষ্য

ছোটবেলার কথা। লোডশেডিং হলে মা প্রায়ই আমাদের ছাদে নিয়ে আকাশের তারা দেখাতেন। এটা সপ্তর্ষিমণ্ডল, ওটা মঙ্গল গ্রহ। মহাকাশ নিয়ে আমার অগ্রহটা তৈরি হয় মূলত তখনই। পরবর্তীকালে উদয়ন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। এতটা বছর পেরিয়ে আজ আমি নির্দিষ্ট বলাতে পারি, এটি আমার জীবনের সেরা কোর্স।

কোর্সে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল মনছবির মেডিটেশন। সেদিন মনছবি করেছিলাম—আমি একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছি। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যটা আমি খুঁজে পেয়েছি মনছবির মেডিটেশনে। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত মনছবির মেডিটেশন করলে এবং সৎসঙ্গে একাত্ম থাকলে একজন মানুষ সহজেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারবে। এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে পারবে সে লক্ষ্য অর্জনের পথে।

আমার ব্রেনই আমাকে দিল সময়োপযোগী পরামর্শ

কোর্স করার পর শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপে নিয়মিত অংশ নিতাম। একটি ওয়ার্কশপে গুরুজী বললেন, আজ মেডিটেশনে আপনারা নিজের ব্রেনের সাথে কথা বলবেন। সেদিন মেডিটেশনে আমার ব্রেন আমাকে বলেছিল, ‘ভুলে যাও যে তুমি ভালো ছাত্র। আর তোমার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবো।’

আজ মনে হয়, আমার ব্রেন সেদিন আমাকে খুব সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ আমার ভেতরে একটা গর্ব ছিল—ক্লাসে প্রথম হচ্ছি না, কিন্তু যদি চাই তবে হয়ে যাব। ব্রেনের পরামর্শ থেকে বুঝলাম, এসব হৈয়ালি ছাড়তে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগ দিতে হবে।

তখন দেশে এস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না। অতএব দেশের বাইরে গিয়ে পড়তে হবে। এজন্যে প্রথমত, ভালো কোনো কলেজের রিকমেন্ডেশন লেটার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এইচএসসি-র পর স্যাট ও টোফেল দিতে হবে। আমি এসএসসি-র পর থেকেই প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম।



মার্চ ১৯৯৬-এ অনুষ্ঠিত ৪২ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে গুরুজীর কাছ থেকে গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট নিচ্ছেন সর্বকনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রুবাব খান

লক্ষ্যে অবিচল থাকার শক্তি যুগিয়েছে মেডিটেশন

স্কুলে পড়ার সময়ই আমি ভালো কলেজে ভর্তির জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছি। ফলে যথাসময়ে নটরডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলাম। বিদেশের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেতে হলো ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমও থাকতে হয়। তাই স্কুল ও কলেজে আমি ডিবেটিং ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব ও কালচারাল ক্লাবে সক্রিয় ছিলাম।

এইচএসসি-র পর যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলাম—যেখানে স্কলারশিপসহ এস্ট্রোফিজিক্স পড়তে পারব। এদিকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ-তে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ভর্তিও হয়ে গেলাম। কেন? কারণ ১২ বছরের একটি কিশোর স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এইচএসসি পরীক্ষার্থী একজন তরুণের জন্যে সেই সাহসী স্বপ্ন দেখা ততটা সহজ নয়। বাস্তবতা আর নানারকম যুক্তি তার মনে ভর করে। আর এ-ক্ষেত্রে মেডিটেশন হতে পারে সবচেয়ে সহায়ক, যা একজন মানুষকে লক্ষ্যের জন্যে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে শক্তি যোগায়।

তাই অভিভাবকদের অনুরোধ করি, আপনার সন্তানের বয়স সাত-আট হলে তাকে মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহলে সে লক্ষ্য স্থির করতে পারবে জীবনের গুরুত্বই। সেইসাথে নিয়মিত মেডিটেশন তাকে দেবে লক্ষ্যের পথে বাধা অতিক্রম করার শক্তি।

প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেই ধরা দেয় সৌভাগ্য

আমি দেখলাম লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধা তিনটি। এক, বাংলা মিডিয়ামে পড়ে ইংরেজি ভালোভাবে শেখা হয় না। দুই, অর্থের সংস্থান আর তিন হচ্ছে, চেষ্টা না করা। ভাষা আমি ভালোভাবে শিখলাম। স্কলারশিপের প্রস্তুতি নিয়ে আবেদন করলাম, ফলে অর্থাত্মব দূর হলো। আর শেষ হচ্ছে চেষ্টা। একজন মানুষ যখন চেষ্টা করে, প্রস্তুতি নেয়, সৌভাগ্য মূলত তার কাছেই ধরা দেয়।

আমি সৌভাগ্যবান। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্ট্রোফিজিক্সে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি মনে করি, মনছবিই ছিল এ-ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। আমি যদি আগে থেকে প্রস্তুতি না নিতাম, তাহলে সৌভাগ্য আমার কাছে এলেও আমি সুযোগটা নিতে পারতাম না।

লক্ষ্যে অবিচলতাই শক্তি

প্রথম সেমিস্টার থেকেই আমি গবেষণার খোঁজ নেয়া শুরু করি। খুঁজতে খুঁজতেই সুযোগ পেলাম বড় ও আলোচিত একটি প্রজেক্টে কাজ করার। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময়ই এই প্রজেক্টের গবেষকদের নামের তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। গবেষকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ।

গ্রাজুয়েশনের পর পিএইচডি প্রোগ্রামে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি কাজের প্রস্তাব পেলাম। আমি যাচাই করে দেখলাম, ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় আমার জন্যে সবচেয়ে ভালো হয়। ওখানে পিএইচডি শুরু করলাম।

পিএইচডির পর ২০১৪-তে আমি যোগ দিলাম যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে। নাসা আমাকে দুই বছরের জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ফেলোশিপ দেয়। ২০১৮ সালে নাসা এ টেলিস্কোপটি মহাকাশে পাঠাবে। এই ফান্ডিংটা পেয়ে আমার নিজের মৌলিক গবেষণার কাজটাও আমি এগিয়ে নিতে পারলাম।

আমার গবেষণায় আমি ইটা ক্যারিনার মতো জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এমন তারাগুলো খুঁজছিলাম। ২০১৫ সালের শেষের দিকে আমি পাঁচটি আলাদা গ্যালাক্সিতে এরকম পাঁচটি সুপারস্টার খুঁজে পেলাম। নাসা তাদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো সংবাদ সম্মেলন করে সবাইকে জানায়। এ আবিষ্কারটি ছিল সেরকমই একটি সাড়া জাগানো আবিষ্কার।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে ২০২৪ সালে ওয়াইন্ড ফিল্ড ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ পাঠানো হবে। এখন আমি সেটা নিয়ে গবেষণা করছি। আমার যে মৌলিক গবেষণা ছিল, তা-ও চালিয়ে যাচ্ছি।

তরুণদের জন্যে আমার পরামর্শ হলো, মনছবির দর্শনটাকে নিজের মাঝে ধারণ করুন। সবসময় মনে রাখুন, আপনার লক্ষ্য কী এবং সেই লক্ষ্যের জন্যে আজ আপনি কী করছেন। যতক্ষণ এই অনুভূতি ভেতরে থাকবে, যত বাধা আসুক, যত সংকটের ভেতর দিয়েই আপনাকে যেতে হোক, মনছবির পথে অবিচল থাকতে এবং শেষপর্যন্ত আপনি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেনই।

১৩৬ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান স্বনির্ভরতার বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করেছে কোয়ান্টাম

১৭ জুলাই কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের ১৩৬ তম আয়োজন। ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ১১০ জন আজীবন রক্তদাতাকে এ অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন। বরেণ্য এ চিকিৎসাবিদ বলেন, ‘বহু বছর আগে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন জরুরি প্রয়োজনে রক্ত সহজে পাওয়া যেত না। ব্লাড ব্যাংক ও রক্তদাতার সংখ্যা খুব কম ছিল। মানুষ রক্তদান করতে ভয় পেত।

অথচ রক্তদান করলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং মানুষের জীবন বাঁচাতে নিয়মিত রক্তদান একটি মহৎ সেবা।

ধাত্রীবিদ্যার চিকিৎসক হিসেবে বলছি, সন্তান জন্মদানের সময় মায়ের প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রয়োজন হয়। আগে রক্তের অভাবে অনেক রোগী মারা যেত। আমরা চিকিৎসকরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছি। তবে এখন পরিস্থিতি বদলেছে। রক্তের অভাবে রোগীর মৃত্যুর পরিমাণ অনেক কমেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে আপনাদের মতো স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কারণে।

আর রক্তদানে মানুষকে সচেতন ও অনুপ্রাণিত করা এবং সেই রক্ত বিনা পয়সায় রোগীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার যে কাজটি কোয়ান্টাম করছে, তা এককথায় অসাধারণ।

কোনোরকম দেশি বা বিদেশি সাহায্য ছাড়া মানুষের সেবায় কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা চাইলে বাইরের কোনো সাহায্য না নিয়েও সফল হতে পারি। স্বনির্ভরতার বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করায় কোয়ান্টামকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি সার্টিফিকেট,



জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুনের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

আইডি কার্ড ও বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের এ দুটি আয়োজনে রক্তদাতারা ছাড়াও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ১৭ বছর

তিন লক্ষাধিক দাতার নিরাপদ রক্তে বেঁচেছে প্রায় নয় লক্ষ প্রাণ

রক্ত সবসময় সবার জন্যে ফ্রি



রক্ত ও রক্ত উপাদানের কোনো বিক্রয়মূল্য হয় না। তাই কোয়ান্টাম ল্যাবে কেবল ব্লাড ব্যাগ ও রক্তের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে মৌলিক পাঁচটি স্ক্রিনিং (হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইডস এবং ম্যালেরিয়া)-এর ন্যূনতম প্রেসেসিং খরচ রাখা হয়।

খোলা থাকছে ২৪ ঘণ্টা

মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে সারা বছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা এ সেবা নেয়ার সুযোগ থাকছে সর্বস্তরের মানুষের জন্যে। নিয়মিত রক্তের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের যে-কোনো দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব।

৮,৯৮,২৭৭ ইউনিট

১৭ বছরে সরবরাহকৃত রক্ত ও রক্ত উপাদান

৩,০৩,৩০৭ জন

ব্লাড ডোনার পুলে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা

৯,২৭২ ইউনিট

স্ক্রিনিং টেস্টে দূষিত গণ্য হওয়ায় বাতিল

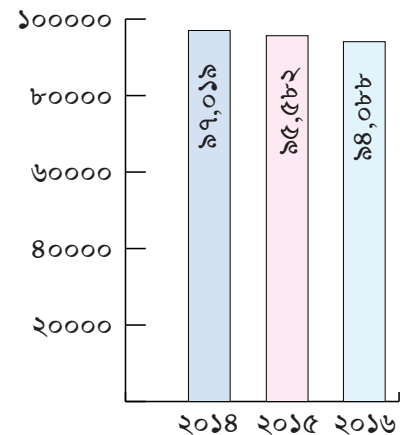
৪৪,২৮৮ ইউনিট

২০১৪ ও ২০১৫-তে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের

চিকিৎসার্থে সরবরাহকৃত ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা

[৩১ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত]

২০১৪ থেকে বার্ষিক সরবরাহ প্রায় ১ লক্ষ ইউনিট



কোয়ান্টাম ল্যাবে অত্যাধুনিক সেল সেপারেটর মেশিনের সাহায্যে রক্তের ৮টি উপাদান সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় এক ব্যাগ রক্ত থেকে প্রয়োজনে চার জনের জীবন বাঁচানো সম্ভব।